গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ১০ সংখ্যা | ১৩ - ১৯ অক্টোবর ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

কংগ্রেস বিরোধী বুলি আওড়ে নরেন্দ্র মোদি জরুরি অবস্থার পথেই

মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর নগ্ন আক্রমণ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৩ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, দিল্লিতে আজ ভোরে কয়েকজন প্রখ্যাত সাংবাদিক, সংবাদকর্মীদের বাড়িতে যেভাবে পুলিশি হানা চালানো হল এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগ তুলে যেভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ইউএপিএ ধারা প্রয়োগ করা হল, তা ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থাকালীন সাংবাদিকদের হেনস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পুলিশের এ হেন কার্যকলাপের কোনও ব্যাখ্যা দিতে অস্বীকার করেছে বিজেপি সরকার। বিজেপি সরকারের ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচারী শাসনে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা যে গভীর সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে, সাম্প্রতিক এই আক্রমণ সে সত্যকে আরও একবার নিশ্চিত করল।

সরকারের এ হেন অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আমরাও তীব্র প্রতিবাদ করছি।

মাত্র ক'দিন আগেই জি-২০ সম্মেলনে বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্রপ্রধানদের সামনে বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি খুব বড় গলা করে বলেছিলেন, ভারত হল গণতন্ত্রের জননীস্বরূপা। গণতন্ত্র নাকি এখানে শিরায় শিরায় প্রবাহিত। প্রধানমন্ত্রীর এই কথাগুলি যে শুধুই বাকচাতুর্য, তা মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে তিনি নিজেই প্রমাণ করে দিলেন গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলে কথিত সংবাদমাধ্যমের উপর হামলা চালিয়ে।

দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে নিউজক্লিক সংবাদ সংস্থার সাংবাদিক ও কর্মীদের বাড়ি বাড়ি একযোগে হানা দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন বিজেপির শিরাতে আসলে বইছে স্বৈরতন্ত্র। পুলিশ এই সব সংবাদকর্মীদের মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করেছে, পুলিশের স্পেশাল সেলের দফতরে তুলে নিয়ে গিয়ে দিনভর জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, কাউকে কাউকে গ্রেফতার করে সন্ত্রাসবিরোধী কঠোর আইন ইউএপিএ ধারায় মামলা করেছে। যদিও নিউজক্লিক জানিয়েছে, কোথায়, কী ভাবে তারা সন্ত্রাসে মদত দিচ্ছে তার কোনও প্রমাণ পুলিশ দেয়নি। কোনও সংবাদমাধ্যমের এবং তার সম্পাদকের বিরুদ্ধে এই ধারায় মামলা এর আগে কখনও হয়নি।

স্বাভাবিক ভাবেই এই তল্লাশি এবং কঠোর আইনে গ্রেফতারকে বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন সহ গণতান্ত্রিক মানুষ, বুদ্ধিজীবীরা তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন এবং ঘটনাটিকে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার উপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ হিসাবেই দেখছেন। এস ইউ সি আই কমিউনিস্ট তীব্র ভাষায় এই আক্রমণের নিন্দা করেছে। সর্বত্রই প্রশ্ন উঠেছে, একটি সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে এমন একটা মারাত্মক আক্রমণ মোদি সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতর করল কেন?

কলকাতার এসপ্ল্যানেডে লেনিন মূর্তি মোড়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কুশপুতুলে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ। ৫ অক্টোবর

কেন্দ্রে গত দু'দশকের বিজেপি শাসনের পর আজ আর কারও জানতে বাকি নেই যে, শুরু থেকেই এই সরকার কোনও রকম সমালোচনা বা বিরোধিতাকে সহ্য করে না— তা সে কোনও ব্যক্তি, সংগঠন বা সংবাদমাধ্যম, যে-ই করুক না কেন। আর এখন তো— যখন সরকারের পাহাড়-প্রমাণ ব্যর্থতার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভ ক্রমাগত

দুয়ের পাতায় দেখুন

নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি সভ্যতা-মানবতা ধ্বংসকারী

পাটনায় পূর্বাঞ্চলীয় শিক্ষা কনভেনশনে শিক্ষাবিদরা

শিক্ষা বাজেট ক্রমাগত কমানো এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাবে দেশে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষার দুর্দশা চরমে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসাবে এসেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০। এই শিক্ষানীতি শিক্ষার বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের নীল-নকশা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিজেপি সরকারের এই জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এআইডিএসও-র ডাকে বিহারে পাটনার বিদ্যাপতি হলে আয়োজিত পূর্ব ভারতীয় শিক্ষা কনভেনশনে ভাষণ দিতে গিয়ে দিল্লি ইউনিভার্সিটি টিচার্স ইউনিয়ন এবং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠনগুলির ফেডারেশন (এফইডিসিইউটিএ)-এর প্রাক্তন সভাপতি ডঃ নন্দিতা নারায়ণ বলেন,

চারের পাতায় দেখুন

পাটনায় শিক্ষা কনভেনশনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা

ব্যবসায়িক স্বার্থের বলি হল সিকিম

৪ অক্টোবর লোহনক হ্রদে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের জেরে হওয়া হড়পা বানে বিধ্বস্ত সিকিম। ইতিমধ্যেই ৪০ জনের মৃতদেহ পাওয়া গেছে, নিখোঁজ শতাধিক। সরকারি হিসেবেই বিপন্ন হয়ে পড়েছেন ৮৬ হাজারেরও বেশি মানুষ। বিপর্যয়ের বেশ কয়েকদিন পরেও মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে নদীর বুকে পাথরের খাঁজে। এমনকি সমতল এলাকা জলপাইগুড়িতে ভেসে এসেছে কিছু নিষ্প্রাণ দেহ। মৃতের সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বলা যাচ্ছে না। সিকিমের লাইফলাইন পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযোগকারী ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। উত্তরবঙ্গের কালিম্পং ও দার্জিলিং জেলার একাংশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রবল বৃষ্টি, হিমবাহের গলন বা ভূমিকম্প একাধিক কারণে এই বিপর্যয়।

কেন্দ্রীয় সরকার সিকিমের ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ করেই দায়িত্ব শেষ করেছে। এ রাজ্যের তৃণমূল সরকার কেন্দ্রের কাছে বরাদ্দের দাবি জানিয়েই দায়িত্ব শেষ করেছে। এর সবগুলিই কোনও না কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মৃত্যু ও ধ্বংসের পরের চেনা ছবি।

এর আগেও উত্তরাখণ্ডে ও হিমাচলপ্রদেশে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপন্ন হয়েছেন অসংখ্য মানুষ। প্রকৃতির নিয়ম না মেনে যথেচ্ছাচারের ফল কী, তার প্রমাণ মিলেছে সেখানেও। তা হলে সিকিম আলাদা কোথায়? সিকিমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে ২০ বছর আগেই একদল গবেষক সে বিষয়ে সরকারকে সতর্ক করেছিলেন। গবেষকদের একজন, দিল্লির জওহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এই বিপর্যয়ের পর প্রকাশ্যে আনেন বিষয়টি। অর্থাৎ বিপর্যয় ঘটতে পারে জানা সত্ত্বেও তা প্রতিরোধে সরকার কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। সরকার যদি এই রিপোর্টকে উপেক্ষা না করত, তাহলে হয়ত এভাবে

ছয়ের পাতায় দেখুন

নরেন্দ্র মোদি জরুরি অবস্থার পথেই

একের পাতার পর

বাড়ছে, নানা ভাবে তা সামনে এসে যাচ্ছে এবং এখানে সেখানে বিক্ষোভ-আন্দোলনের আকারে ফেটে পড়ছে, তখন একের পর এক বিধানসভা, লোকসভা নির্বাচনের সামনে সেই ক্ষোভকে আড়াল করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সরকার। ইতিমধ্যেই মোদি সরকারের ঘনিষ্ঠ বৃহৎ পুঁজির মালিকরা অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমকে কিনে নিয়ে দেশ জুড়ে মোদি-ভজনার স্রোত বইয়ে দিচ্ছে এবং জনমনে গোদী-মিডিয়া (সরকারের কোলে বসা) হিসাবে কুখ্যাতি কুড়িয়েছে। বাকি মিডিয়াগুলি যারা মোদি সরকারের কীর্তনের বিরুদ্ধে গিয়ে সত্য তুলে ধরতে চেয়েছে, তাদের সহবত শেখাতে তাই এ ভাবে 'ঝিকে মেরে বউকে শেখানো'র চেষ্টা।

বাস্তবে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পাওয়ার মতো কোনও কাজ মোদি সরকারের দশ বছরের ইতিহাসে নেই। মূল্যবৃদ্ধি কিংবা বেকারিতে লাগাম পরানো, চাষিদের আয় বৃদ্ধি থেকে কালো টাকা উদ্ধার— কোনও একটি প্রতিশ্রুতিও এই সরকার রক্ষা করতে পারেনি। বরং মোদি জমানায় এই প্রতিটি সমস্যা আরও তীব্র আকার নিয়েছে। অন্য সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের মতোই ভারতের অবস্থাও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক সমস্ত দিক থেকে মোদি শাসনে শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছেছে। এবং সেই দুরবস্থা এমনই মাত্রাছাড়া যে, কোনও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি কিংবা কথার চমক, কিছু দিয়েই আর তা চাপা দেওয়া যাচ্ছে না। ফলে মানুষের ক্ষোভ আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে।

গত লোকসভা নির্বাচনের আগে গণবিক্ষোভ প্রবল হয়ে উঠলে মোদি সরকার পুলওয়ামা হামলার ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের একাংশের মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ঢেউ তুলতে পেরেছিল, যা সেই বিক্ষোভকে খানিকটা হলেও চাপা দিতে সক্ষম হয়েছিল। এ বার বিক্ষুব্ধ মানুষকে চমকে দিয়ে তাদের জীবনের সমস্যাগুলি থেকে দৃষ্টিকে সরিয়ে দিতে গোপনীয়তার ছলনায় লোকসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকে তড়িঘড়ি মহিলা বিল নিয়ে এল। কিন্তু দেশের এমনকি সাধারণ মানুষেরও ধরতে অসুবিধা হয়নি যে, বিল পাশ করানোর আসল উদ্দেশ্য মানুষকে চমকে দেওয়া, তা কার্যকর করা নয়। স্বাভাবিক ভাবেই জনমনে তা কোনও আলোড়নই তৈরি করতে পারেনি।

এই অবস্থায় একটি স্বৈরাচারী সরকারের সামনে আর একটি রাস্তাই খোলা থাকে। তা হল, গায়ের জোরে সমালোচনার মুখ বন্ধ করে দেওয়া। দেশে এখনও যে অজস্র সংবেদনশীল মানুষ, চিন্তাশীল গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন বিভিন্ন পেশার মানুষ এবং বুদ্ধিজীবীরা রয়েছেন, তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে যে সমালোচনাগুলি প্রকাশ পাচ্ছে, সেগুলি যাতে আরও বড় হয়ে দেখা না দেয়, সেই জন্য বিজেপির কাছে সংবাদ মাধ্যমের কণ্ঠরোধ করাটা খুবই জরুরি। আজ সরকারের নীতির বিরোধিতাকে— যে নীতির একমাত্র লক্ষ্য দেশের একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করা— সরকারের সমালোচনাকে আটকাতে সেগুলিকে দেশবিরোধিতা হিসাবে দাগিয়ে দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা তাদের অন্যতম কৌশল হয়ে উঠেছে। এর আসল লক্ষ্য, সব ধরনের সমালোচককে ভয় দেখানো, সমঝে দেওয়া, বুঝিয়ে দেওয়া যে, আমার বিরুদ্ধে মুখ খুললে দুর্গতি আছে। দেখো কী করতে পারি। আমার বিরুদ্ধে বললেই ইউএপিএ দিয়ে লাইফ হেল করে দেব। জেলে পচতে হবে। অর্থাৎ সারা দেশে এমন একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করো যাতে যে কেউ সরকারের সমালোচনা করতে ভয় পায়। এটা অবশ্য কোনও নতুন বৈশিষ্ট্য নয়, যে কোনও স্বৈরশাসকেরই রূপ এটি।

সে জন্য বিজেপি শাসনে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা তলানিতে পৌঁছেছে। ২০২৩-এ ১৮০টি দেশের মধ্যে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার সূচকে ভারত নামতে নামতে ১৬১তম স্থানে এসেছে। ২০২২-এও ভারত ১৫০তম স্থানে ছিল। গত তিন দশকে ভারত এত নিচে কখনও নামেনি। এর একমাত্র কারণ, গোটা সংবাদমাধ্যমকে বিজেপির দলীয় মুখপত্রে পরিণত করার অপচেষ্টা।

বিরোধিতা দমন করতে বিজেপি সরকার যে 'ডাইনি খোঁজা' চালাচ্ছে তার আর একটি হাতিয়ার হল যে কোনও বিরোধীকে 'আরবান নকশাল' বলে দেগে দেওয়া। নকশালরা তাদের কাজের জন্য দাগী হয়ে গিয়েছে বলে, (নকশাল রাজনীতিকে সমর্থন না করেও বলা যায়) কাউকে দমন করতে তার গায়ে নকশাল, উগ্রপন্থী বা দেশবিরোধী ছাপ লাগিয়ে দিলেই তার বিরুদ্ধে যে কোনও ধারা দেওয়া যায়, যে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যায়। ঠিক যেমন সংখ্যালঘুদের ভয় দেখাতে গোমাংস রাখার অভিযোগ তুলে তাদের পিটিয়ে হত্যা করা হয়। কিংবা হাথরসের মতো ঘটনায় অপরাধীদের বিরুদ্ধে লেখা সমাজে বিভেদের প্ররোচনা তৈরি করতে পারে এমন উদ্ভট অভিযোগ তুলেই কোনও সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ইউএপিএ দিয়ে তাঁকে বছরের পর বছর জেলে আটকে রাখা যায়। স্বাভাবিক ভাবেই শাসক শিবিরের এই সব কার্যকলাপ নিয়ে যত দিন যাবে ততই আরও কথা উঠবে। আর সেই কথা যাতে না ছড়ায় তাই মিডিয়াকে দুর্বল করার, মানুষের কথা বলার, মত প্রকাশের অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার লক্ষ্য থেকেই সংবাদমাধ্যমের উপর এমন হামলা।

আজ যে কোনও বিরোধিতাকে দমন করতে প্রধানমন্ত্রী যে ইউএপিএ-কে ব্যবহার করছেন সেই দানবীয় আইনটি— প্রধানমন্ত্রী থেকে অন্য বিজেপি নেতারা হয় কথায় নয় কথায় যে কংগ্রেসের বিরোধিতা করেন, সেই কংগ্রেসেরই তৈরি করা। আজ নিজেদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকে দমন করতে যে অঘোষিত জরুরি অবস্থা প্রধানমন্ত্রী দেশজুড়ে জারি করেছেন তা-ও তো তাঁর এক পূর্বসূরি কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঠিক একই রকম ভাবে তাঁর সম্পর্কে বিরোধিতাকে দমন করতেই দেশে জারি করেছিলেন। পেরেছিলেন নাকি বিরোধী স্বরকে দমন করতে? হ্যাঁ, সাময়িক কিছু মানুষকে তিনি জেলে ভরে হেনস্থা করতে পেরেছিলেন, কিন্তু মানুষ সুযোগ পেয়েই তাঁকে ক্ষমতা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এই দেওয়াল লিখনটি মোদি-অমিত শাহদের জানা উচিত।

পুঁজিবাদ যত সংহত হয়, একচেটিয়া রূপ নেয় তত সে স্বৈরতন্ত্রী, আগ্রাসী ফ্যাসিস্ট রূপ নেয়। ততই সে গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরে। বিজেপি ঠিক সেই কাজই আজ করছে। এই অবস্থায় দেশে আজ যদি গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হয়, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করতে হয়, মানুষের মত প্রকাশের অধিকারকে রক্ষা করতে হয় তবে বিজেপি সরকারের এমন একের পর এক আক্রমণের বিরুদ্ধে এখনই সরাসরি প্রতিবাদ করে রাস্তায় নামতে হবে। নির্বাচনে সিটের হিসেব কষে, কিংবা ঘরে বসে ফেসবুকে, টুইটারে মন্তব্য করে তা হবে না।

সমাজমাধ্যমে প্রতিবাদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু ওতেই সীমাবদ্ধ থাকলে আজ আর হবে না। প্রতিবাদকে সংগঠিত রূপ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, আক্রমণটা বিজেপির হাত দিয়ে এলেও আক্রমণটা আসলে মুমূর্ষু, প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের। এই পুঁজিবাদ যতদিন টিকে থাকবে, তার সেবক দলগুলি কঠোর ভাবে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করবেই। সরকার আজ এমনই স্বৈরতন্ত্রী হয়ে উঠেছে যে, যে কোনও সময় যে কারও দরজায় হানা দিতে পারে। তাই আজ ঘরে বসে প্রতিবাদের দিন শেষ। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছে। নিউজক্লিকের বিরুদ্ধে হামলার বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ সংগঠিত করেছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কুশপুতুল পুড়িয়েছে। একজন গণতন্ত্রপ্রিয়, সচেতন মানুষ হিসাবে আপনিও প্রতিবাদে সামিল হোন।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য এবং এ আই ডি ওয়াই ও-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও রাজ্য কমিটির কোষাধ্যক্ষ কমরেড সুকান্ত সিকদার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ রোগভোগের পর ৬ অক্টোবর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর।

কৈশোরেই পরিবারের সূত্রে তিনি দলের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৯০-এর দশকের শুরুর দিকে কলকাতার বেহালা অঞ্চলে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র কাজকর্ম তিনি শুরু করেন। পরবর্তীকালে ওই অঞ্চলে তিনি ছাত্র সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নেন। ডাক নাম লেন্টুস, এই নামেই তাঁর পরিচিতি গড়ে ওঠে। দলের বড়িশা আঞ্চলিক কমিটির ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ছাত্র সংগঠনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর যুব সংগঠনের দায়িত্বে এসে তিনি রাজ্য এমনকি সর্বভারতীয় স্তরে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে।

কমরেড সুকান্ত সিকদার ছোট থেকে বড় যে কোনও মানুষের সঙ্গে অবলীলায় মিশতে পারতেন, আবার তাদের এমনকি নেতাদেরও ভুলভ্রান্তি দেখলে সুন্দরভাবে তা ধরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা তাঁর সব সময় থাকত। মধুর স্বভাবের সাথে মিশে থাকা ঋজু চরিত্র ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। এর মধ্য দিয়ে দলের ভিতরে ও বাইরে অগণিত মানুষের মধ্যে যে ছাপ তিনি ফেলতে পেরেছেন সকলের কাছেই তা অনুসরণযোগ্য। জুনিয়র কমরেডদের কাছে তাঁর জায়গা ছিল অবারিত, বহু ছাত্র-যুবক তাঁর সাহচর্যে এসে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার অনুপ্রেরণা পেত। কারও কাছ থেকে আঘাত পেলেও তিনি কাউকে কখনও প্রত্যাঘাত করেননি। কখনও সামনে আসার প্রবণতা ছিল না, বরং অন্যদের এগিয়ে দিতেন।

কমরেড সুকান্ত সিকদারের পরোপকারী মন, মানুষকে কাছে টেনে নেওয়ার ক্ষমতা, নির্মল চরিত্রের সঙ্গে তাঁর অনাবিল হাসি মানুষকে আকর্ষণ করত। বাসস্থান এলাকায় বহু পরিবারের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় যোগাযোগ। এমনকি ভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার সম্পর্ক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। আদর্শগত চর্চার ক্ষেত্রেও তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। নেতাদের বারবার বলতেন যা দরকার সেই তুলনায় এই মান আমি অর্জন করিনি। যদিও জীবনের নানা পর্যায়ে দেখা গেছে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা যতটুকু বুঝেছেন তা নাড়ির সঙ্গে মিশে গেছে। সেজন্যই তিনি মানুষকে শুধু আকর্ষণ করতেন না, তাদের মনে একটা ছাপ ফেলতে পারতেন।

যে সময় তিনি নিজের সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে তোলার জন্য নিবিড় সংগ্রাম শুরু করেছিলেন এবং আরও বড় দায়িত্ব নেওয়ার জায়গায় আসছিলেন, ঠিক সেই সময় দুরারোগ্য ক্যান্সার তাঁকে কেড়ে নিল। রোগশয্যাতেও তিনি অত্যন্ত দৃঢ় চরিত্রের পরিচয় দিয়ে গেছেন। কমরেড এবং চিকিৎসকদের কাছে বারবার বলতেন, আমি এই লড়াইটা ঠিক মতো করতে পারছি তো? তাঁর এই রোগের ব্যয়বহুল চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহে সংগঠনের কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি তাঁর বাসস্থান এলাকার ক্লাব যেভাবে ভূমিকা নিয়েছে তাতে বোঝা যায় মানুষের কী গভীর ভালবাসা তিনি অর্জন করেছিলেন। হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময় চিকিৎসক নার্স অ্যাটেনডেন্ট অন্যান্য কর্মী— সকলের এত আপন হয়ে উঠেছিলেন যে একজন রোগীর মৃত্যু গোটা হাসপাতালের সকলকে কাঁদিয়েছে। এমনকি যখন বুঝতে পারছিলেন এ রোগ আর সারবার নয়, সেই সময়েও তাঁর বাবা, মা, দাদার অসুস্থতা, পরিবারের অভাব, স্ত্রী এবং নাবালক সন্তানের ভবিষ্যৎ এসব সমস্যা নিয়ে কোনও দিন বলতে শোনা যায়নি, সাংগঠনিক সমস্যাতেই মাথা ঘামিয়েছেন। পরিবারের কঠিন সমস্যা কখনও তাঁর মুখের হাসি কেড়ে নিতে পারেনি। কোনও দিন লেখালেখি করেননি, কিন্তু অসুস্থ অবস্থাতেও দলের কাজ করার জন্য লেখালেখি শুরু করেন। দলের মিডিয়া টিমের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। পরিবার সম্পর্কে পার্টির মত নিয়ে চলার চেষ্টা করেছেন সব সময়। তাঁদের পরিবারের প্রায় সকলেই দলের কর্মী বা সমর্থক। তার মধ্যেও যাঁরা সঠিক ভূমিকা নিতে পারছেন না, রোগশয্যা থেকে তাঁদের কাছে আবেদন পাঠিয়েছেন।

কমরেড সুকান্ত সিকদারের সংক্ষিপ্ত অথচ সম্ভাবনাময় বিপ্লবী জীবন দলের কর্মী-সমর্থকদের কাছে স্মরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

কমরেড সুকান্ত সিকদার লাল সেলাম

রাষ্ট্র হল অনিরসনীয় শ্রেণি-বিরোধের ফল

ভি আই লেনিন

এ বছরটি বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও রুশ বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ। এই উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে বর্ষব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে গণদাবীতে তাঁর বিভিন্ন রচনার অংশ আমরা প্রকাশ করছি। এবার 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব'-এর অংশবিশেষ।

নিপীড়িত শ্রেণিগুলির মুক্তি সংগ্রামে তাদের চিন্তানায়কদের মতবাদের ক্ষেত্রে ইতিহাসে একাধিকবার যা ঘটেছে, বর্তমানে তাই ঘটছে মার্ক্সের মতবাদ নিয়েও। মহান বিপ্লবীদের জীবদ্দশায় উৎপীড়কেরা তাঁদের ওপর অবিরাম নিগ্রহ চালিয়েছে, তাঁদের মতবাদকে আক্রমণ করেছে অতি হিংস্র বিদ্বেষে, অতি ক্ষিপ্ত ঘৃণায় এবং মিথ্যা ও কুৎসার অতি বেপরোয়া অভিযানে। মৃত্যুর পর চেষ্টা হয়েছে তাঁদের নিরীহ দেবমূর্তিতে পরিণত করতে, বলা যায়, তাদের উপর সাধুর মাহাত্ম্য আরোপ করা হয়, নিপীড়িত শ্রেণিগুলির 'সান্ত্বনার' জন্য, তাদের বোকা বানাবার জন্য।

এ জন্য মহান বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক মতবাদের মর্মবস্তুকে বিসর্জন দিয়ে, তার বৈপ্লবিক ধার ভোঁতা করে, তাকে ছেঁদো করে তুলে, তাঁদের নামের পাশে খানিকটা জ্যোতি আরোপ করার চেষ্টা চলে। মার্কসবাদের এই রকম বিকৃতীকরণে বর্তমানে হাত মেলাচ্ছে বুর্জোয়ারা এবং শ্রমিক আন্দোলনের ভেতরকার সুবিধাবাদীরা। তারা ত্যাগ করছে, অস্পষ্ট করে দিচ্ছে, বিকৃত করছে মতবাদের বিপ্লবী দিকটা, তার বৈপ্লবিক প্রাণসত্তাটা। বুর্জোয়াদের কাছে যা গ্রহণযোগ্য, বা যা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে সেইটাকে তারা তুলে ধরছে প্রধান করে, জয়গান গাইছে তার। সমস্ত উৎকট স্বাদেশিকতাবাদীরাই (সোস্যাল শোভিনিস্ট) এখন 'মার্ক্সবাদী'— ঠাট্টা নয়! মার্ক্সবাদ সংহারে বিশেষজ্ঞ, গতকালের সমস্ত জার্মান বুর্জোয়া পণ্ডিতই এখন ঘন ঘন বলছেন 'জার্মান জাতীয়' মার্ক্সের কথা, যিনি নাকি অমন চমৎকার সংগঠিত শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে গেছেন লুঠেরা যুদ্ধ চালাবার জন্য!

অবস্থা এই হওয়ায়, মার্ক্সবাদের বিকৃতির এমন অভূতপূর্ব প্রচার লাভ করায় আমাদের প্রধান কর্তব্য হল রাষ্ট্র বিষয়ে মার্ক্সের আসল শিক্ষার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তার জন্য মার্ক্স ও এঙ্গেলসের নিজস্ব রচনা থেকে একগুচ্ছ দীর্ঘ উদ্ধৃতি তুলে ধরা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে বক্তব্য গুরুভার হয়ে ওঠে, জনগণের বোধগম্য হয়ে ওঠায় খানিকটা অসুবিধা হয়। কিন্তু তা বাদ দিয়ে চলা একেবারেই অসম্ভব। মার্ক্স ও এঙ্গেলসের রচনার বিষয়ে যেখানে উল্লেখ আছে তেমন সমস্ত জায়গা, অন্তত নির্ধারক জায়গাগুলিকে যথাসম্ভব সম্পূর্ণাকারে আবশ্যিকভাবেই উদ্ধৃত করা উচিত, তাতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, সে দৃষ্টির বিকাশ সম্পর্কে পাঠক স্বাধীনভাবে একটা ধারণা লাভ করবেন, সেই সঙ্গে বর্তমানে আধিপত্যকারী 'কাউটস্কিপন্থীরা' তাদের যেসব বিকৃতি ঘটিয়েছে তা দলিলপত্র সহকারে প্রমাণিত ও জাজ্বল্যমান রূপে প্রদর্শিত হবে।

শুরু করা যাক ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের সর্বাধিক প্রচারিত রচনা 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' দিয়ে, ১৮৯৪ সালে স্টুটগার্ট থেকে তার ৬ষ্ঠ সংস্করণ ইতিমধ্যেই বেরিয়েছে। আমাদের অনুবাদ করে দিতে হচ্ছে মূল জার্মান থেকে, কেন না বহু রুশ অনুবাদ থাকলেও তার অধিকাংশই হয় অসম্পূর্ণ, নয় একেবারেই সন্তোষজনক নয়। নিজের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের খতিয়ান টেনে এঙ্গেলস বলছেন :

'রাষ্ট্র মোটেই বাইরে থেকে সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া একটি শক্তি নয়, সেই সঙ্গে, হেগেল যা বলতেন, 'নৈতিক ভাবের বাস্তবতা', 'প্রজ্ঞার প্রতিচ্ছবি ও বাস্তবতা'ও নয়। রাষ্ট্র হল একটা নির্দিষ্ট পর্বে সমাজের বিকাশের ফল;রাষ্ট্র হল এই স্বীকৃতি যে, সমাজটা অনিরসনীয় স্ববিরোধে জড়িয়ে পড়েছে, এমন আপসহীন বৈপরীত্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছে যা থেকে মুক্তিলাভে সে অক্ষম। এই বৈপরীত্যগুলি, বিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণিগুলি যাতে নিষ্ফল সংগ্রামে নিজেদের ও সমাজকে ধ্বংস করে না বসে, তার জন্য দরকার পড়েছিল এমন একটি শক্তির যা দৃশ্যত সমাজের ঊর্ধ্বে দণ্ডায়মান, যা সংঘর্ষকে প্রশমিত করে আনবে, তাকে 'শৃঙ্খলার' সীমানার মধ্যে ধরে রাখবে। সমাজ থেকে উদ্ভূত কিন্তু সমাজের ঊর্ধ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠিত, ক্রমেই বেশি করে সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলা এই শক্তিই হল রাষ্ট্র।' (১৭৭-১৭৮ পৃঃ, ৬ষ্ঠ জার্মান সংস্করণ।)

এখানে রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও তার তাৎপর্যের প্রশ্নে মার্ক্সবাদের মূল ভাবনা অভিব্যক্ত হয়েছে পরিপূর্ণ স্পষ্টতায়। রাষ্ট্র হল অনিরসনীয় শ্রেণি-বিরোধের ফল ও অভিব্যক্তি। রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় সেইখানে, সেই সময়, এবং সেই পরিমাণে, যেখানে, যে সময় এবং যে পরিমাণে বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রেণিবিরোধ অমীমাংসিত থেকে যায়। এবং বিপরীতপক্ষে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, শ্রেণি-বিরোধের নিরসন অসম্ভব।

এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক পয়েন্টটি থেকেই শুরু হয় মার্কসবাদের বিকৃতি— যা চলছে দুটি প্রধান ধারায়।

একদিকে, তর্কাতীত ঐতিহাসিক ঘটনায় যাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে, রাষ্ট্র আছে শুধু সেইখানে, যেখানে আছে শ্রেণি-বিরোধ ও শ্রেণিসংগ্রাম, সেই সব বুর্জোয়া ও বিশেষ করে পেটি বুর্জোয়া মতবাদের প্রবক্তারা মার্ক্সকে একটু 'শুধরে নিচ্ছেন' এই ভাবে, যেন রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণি-মিটমাটের সংস্থা। মার্ক্সের মতে শ্রেণিবিরোধ মিটমাট সম্ভব হলে রাষ্ট্রের উদ্ভবও হত না, তা টিকেও থাকত না। এটাকে দেখিয়ে মধ্যবিত্ত ও কূপমণ্ডুক অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিকরা প্রায়শই মার্ক্সের ভক্ত সেজে এই কথাটাকেই উপস্থিত করে এ ভাবে যে, রাষ্ট্র নাকি ঠিকভাবে শ্রেণি-মিটমাটই করে থাকে। মার্ক্সের মতে, রাষ্ট্র হল শ্রেণি-শাসনের যন্ত্র, এক শ্রেণি কর্তৃক অপর শ্রেণিকে পীড়নের হাতিয়ার, রাষ্ট্র হল এমন 'শৃঙ্খলার' প্রতিষ্ঠা, যাতে শ্রেণি-সংঘাত প্রশমিত করে এই পীড়নকে বিধিবদ্ধ করে ও স্থায়িত্ব দেয়। পেটি বুর্জোয়া রাজনীতিকদের মতে, শৃঙ্খলার মানে এক শ্রেণি কর্তৃক অপর শ্রেণির পীড়ন নয়, একান্তরূপেই শ্রেণি-মিটমাট; সংঘাত প্রশমিত করার মানে নাকি মিটমাট করা, নিপীড়ক শ্রেণিকে উচ্ছেদের সংগ্রামে নিপীড়িত শ্রেণির হাতে যা আছে তার নির্দিষ্ট কিছু উপায় ও উপকরণ ছিনিয়ে নেওয়া নয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯১৭ সালের বিপ্লবে যখন রাষ্ট্রের তাৎপর্য ও ভূমিকার প্রশ্নটি তার সমস্ত ব্যাপকতা নিয়ে সামনে দাঁড়ায়, কার্যক্ষেত্রে তা যখন হয়ে দাঁড়ায় অবিলম্বে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার প্রশ্ন, তদুপরি সামগ্রিক ভাবে তা প্রয়োগের প্রশ্ন, তখন সমস্ত সোস্যালিস্ট রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকরা তৎক্ষণাৎ এই পেটি বুর্জোয়া তত্ত্বে নেমে যায় যে, রাষ্ট্রের কাজ শ্রেণিবিরোধকে মিটমাট করা। এই দুই পার্টির রাজনীতিকদের অসংখ্য প্রস্তাব ও প্রবন্ধ'মিটমাটের' এই মধ্যবিত্ত ও কূপমণ্ডুক তত্ত্বে পুরোপুরি আচ্ছন্ন। রাষ্ট্র যে একটা নির্দিষ্ট শ্রেণির প্রভুত্বের সংস্থা, এ শ্রেণি যে তার প্রতিপক্ষের (তার বিপরীত শ্রেণির) সঙ্গে মিটমাট করে নিতে পারে না, পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্র এ কথা কখনওই বুঝতে পারে না। আমাদের সোসালিস্ট রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকরা যে আদৌ সমাজতন্ত্রী নয় (যেটা আমরা বলশেভিকরা বরাবর দেখিয়ে এসেছি), প্রায়-সমাজতান্ত্রিক বুলিওয়ালা পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী মাত্র, তার অতি জাজ্বল্যমান একটি প্রকাশ হল রাষ্ট্রের প্রতি তাদের মনোভাব।

অন্য দিকে, মার্ক্সবাদের 'কাউটস্কি-মার্কা' বিকৃতিটা অনেক সুক্ষ্ম। রাষ্ট্র শ্রেণি-শাসনের যন্ত্র, অথবা শ্রেণি বিরোধ অনিরসনীয়— এর কোনওটাই তারা 'তত্ত্বের দিক থেকে' অস্বীকার করে না। কিন্তু নজরে পড়ছে না অথবা ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে এই কথাটা যে : রাষ্ট্র যদি হয় অনিরসনীয় শ্রেণি-বিরোধের ফল, তা যদি হয় সমাজের ঊর্ধ্বে দণ্ডায়মান ও 'ক্রমেই বেশি করে সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলা' এক শক্তি, তা হলে এ কথা পরিষ্কার যে শুধু, সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়াই নয়, রাষ্ট্রশক্তির যে যন্ত্রটা প্রভুত্বকারী শ্রেণির সৃষ্টি, যার মধ্যে এই 'বিচ্ছিন্নতা' রূপ পেয়েছে, তাকেও বিলুপ্ত না করে নিপীড়িত শ্রেণির মুক্তি অসম্ভব। আমরা পরে দেখাব, মার্ক্স ইতিহাসসম্মত সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণের শক্তির জোরে বিপ্লবের কর্তব্য সম্বন্ধে যে স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা তত্ত্বগত ভাবে নিজেই নিজেকে সত্য বলে প্রমাণ করে। ঠিক এই সিদ্ধান্তটাই কাউটস্কি 'ভুলে বসেছেন' ও বিকৃত করেছেন, পরে আমরা বিশদে তা দেখাব।

'রাষ্ট্র মোটেই বাইরে থেকে সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া একটি শক্তি নয়। রাষ্ট্র হল একটা নির্দিষ্ট পর্বে সমাজের বিকাশের ফল। রাষ্ট্র হল এই স্বীকৃতি যে, সমাজটা অনিরসনীয় স্ববিরোধে জড়িয়ে পড়েছে, এমন আপসহীন বৈপরীত্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছে যা থেকে মুক্তিলাভে সে অক্ষম।

কোলাঘাটে বিডিও ডেপুটেশন

পূর্ব মেদিনীপুরে কোলাঘাট ব্লকের নিকাশি খালগুলির দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়া এবং দেনান-দেহাটি জলনিকাশি প্রকল্প সম্পূর্ণ রূপায়িত না হওয়ায় জলমগ্ন বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যাতায়াতের অসুবিধায় জনজীবন বিপর্যস্ত। এই অবস্থায় দেনান-দেহাটি জলনিকাশি প্রকল্প অবিলম্বে রূপায়ণ, চাপদা-গাজই খালে জমে থাকা কচুরিপানা তোলা, টোপা ড্রেনেজ খাল সংস্কার, নিকাশি খালের চরে বনসৃজনের গাছ লাগানো সহ অবৈধ নির্মাণ বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি এগার দফা দাবিতে কৃষক সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর বিডিও-র কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, সহকারী সম্পাদক মোহন দাস, গোবিন্দ পড়িয়া, তপন মাইতি, সহসভাপতি মধুসূদন ভৌমিক প্রমুখ। বিডিও এবং সেচ দপ্তরের আধিকারিকগণ দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

এআইডিএসও-র রাজনৈতিক ক্লাস

এআইডিএসও-র কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে ৫ অক্টোবর সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তরে বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের রচিত 'মার্কসবাদ ও মানব সমাজের বিকাশ প্রসঙ্গে' বইটির উপর বিভিন্ন প্রশ্নের ভিত্তিতে এক রাজনৈতিক ক্লাস আয়োজিত হয়।

পরিচালনা করেন সংগঠনের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি, এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুব্রত গৌড়ী। উপস্থিত ছিলেন এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুস্মিতা মণ্ডল সহ জেলা নেতৃবৃন্দ। ক্লাসে কলকাতা জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আঞ্চলিক ইউনিটের ছাত্রছাত্রীরা আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করেন।

নতুন সূর্যোদয়ের আশা

গত আগস্ট মাসে এসইউসিআই(সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক মহাশয় শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের পাঠানো একটি চিঠি পেয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছি। সে প্রসঙ্গে দু চারটে কথা জানাতে আমার এই চিঠি।

প্রযুক্তির গুঁতোয় আমাদের হারিয়ে যাওয়া অভ্যাসগুলোর অন্যতম হল চিঠি। আমাদের 'কুল' জীবনধারায় 'আউট অফ ট্রেন্ড'। গুমোট গরমের এক সন্ধ্যায় সারাদিন পরে বাড়ি ফিরে দেখি আমার পড়ার টেবিলের ওপর রাখা একটি সাদা খাম। তার উপর সযত্নে লেখা আমার নাম। চিঠির খাম হাতে তুলে আমার সেই আহ্লাদে আটখানা হওয়া দেখলে ফেসবুক, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, জিমেল, টেলিগ্রাম দীর্ঘশ্বাস ফেলত, লজ্জায় মুখ লুকোত দশ ইঞ্চি ফোনের অতল গভীরে। অত্যাধুনিক ভিডিও কলিংয়ের যুগে একটা সাদা কাগজের উপর কালো হরফে লেখা স্থির কথাগুলোর আন্তরিকতা এমনই। অনেকে বলবেন, এ আর এমন কী! আটপৌরে অতীতের দেরাজ হাতড়ানো বাঙালিদের চিরকালের স্বভাব! এ তো গেল আমাদের স্মৃতি-মেদুরতার কথা। এবার আসি মূল বিষয়ে।

'এই সফলতার ক্ষেত্রে আপনি যেভাবে আর্থিক সাহায্য সহ সর্বব্যাপক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তার জন্য আমরা আমাদের দলের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে আপনাকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, যে সমাজে কোটি কোটি টাকায় চাকরি বিক্রি করা হয়, রাজমুকুট ওঠে দুর্জনের মাথায়, শিরোপা পাওয়া যায় চুরি-জোচ্চুরি করলে, সেই সমাজে এমন রাজনৈতিক দল, এমন নেতৃবৃন্দ, এমন সংগঠন এখনও আছে, যারা আমার থেকে মাত্র দু'শত টাকা অর্থসাহায্য পেয়ে সাদরে গ্রহণ করেন এবং যত্ন করে এমন একটি চিঠি লেখেন! সম্বোধনের 'প্রিয় সাথী'—ছোট্ট দুটো শব্দ যে নির্ভেজাল আন্তরিকতার পাঠ দেয়, তা বহুমূল্য আজকের সমাজে, যেখানে অমার্জিত কথার দাপটে কীভাবে নয়কে হয় করতে হয় তারই নিত্যনতুন ফর্মুলা বের হচ্ছে। আজকের দিনে বেহালার রয়েড পার্কের মতো তথাকথিত শিক্ষিত পাড়াতেও চাঁদার জুলুমে রিটায়ার্ড বৃদ্ধ-বৃদ্ধার চোখের জল পড়ে। বেকার দম্পতির দীর্ঘশ্বাস পড়ে। কারও নাতির সামনে, কারও মেয়ের সামনে হওয়া এই অপমানে মলিন হয়ে থাকে শরতের বাতাস।

'এই সফলতার ক্ষেত্রে আপনি যেভাবে আর্থিক সাহায্য...' ৫ আগস্টের ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের সমাবেশে লক্ষাধিক মানুষের ঢল আমি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ না করলে হয়তো বিশ্বাস করতাম না এই সফলতার বিবরণ। ঘটনাচক্রে অফিসের কাজে সেদিন আমাকে খড়্গপুর যেতে হয়েছিল এবং বিকেল চারটে নাগাদ পার্ক স্ট্রিট হয়ে বেহালা ফেরার সময়ে চোখে পড়ে অগণিত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি।

যে সংবাদমাধ্যম প্রাক্তন মেয়রের অন্দরমহলের কেলেঙ্কারি, এই যুগের মহানায়ক-দেশনায়কদের দেদার চুরি-জোচ্চুরি এবং 'বিশেষজ্ঞ' সাজিয়ে হাতে গোনা কয়েকজন চেনা মুখের 'স্বল্পশিক্ষা ভয়ঙ্করী' বক্তব্য বিক্রি করে টিকে আছে, তারাও বাধ্য হয় আপনাদের এই জন সমাবেশকে সম্প্রচার করতে। আন্তরিক অভিনন্দন আপনাদের। আপনাদের সকল কর্মীর বিনম্র ব্যবহার, মার্জিত রুচি, বিনীত কথাবার্তা, নিরলস পরিশ্রম দেখে আমি মুগ্ধ, অভিভূত। আমার চিঠি শেষ করছি অশিক্ষার কুয়াশা কেটে গিয়ে নতুন সূর্যোদয়ের প্রার্থনা দিয়ে।

সোহিনী রায়চৌধুরী, বেহালা

হিড়বাঁধে কৃষক অবস্থান

বাঁকুড়ার হিড়বাঁধ ব্লকে এআইকেকেএমএস-এর উদ্যোগে ২৬-২৯ সেপ্টেম্বর চারদিন কৃষক-খেতমজুরদের অবস্থান বিক্ষোভ হয়। ব্লককে খরাপীড়িত ঘোষণা, স্থায়ী সেচের ব্যবস্থা, সারের কালোবাজারি বন্ধ, একশো দিনের কাজে বকেয়া মজুরি ও নতুন নিয়োগ, ফসলের এমএসপি আইনসম্মত করা, বিদ্যুৎ আইন বাতিল করা, রেশনে বিনামূল্যে দ্বিগুণ পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ, ছাত্রছাত্রীদের ফি মকুব ইত্যাদি দাবিতে ব্লকের ৫টি অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম থেকে দুশোর বেশি কৃষক ও খেতমজুর এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। এর আগে কমিটির সদস্যদের উদ্যোগে ব্লকের প্রধান গঞ্জগুলিতে কর্মসূচির প্রচারে পথসভা করা হয়।

ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবস্থান মঞ্চ থেকে আন্দোলনকারীদের ডেকে পাঠানো হলে সংগঠনের সম্পাদক কমরেড অশোক মণ্ডলের নেতৃত্বে পাঁচ জনের প্রতিনিধি দল বিডিও-র সঙ্গে দেখা করে। বিডিও দাবিগুলির সঙ্গে সহমত ব্যক্ত করে বলেন, দাবি পূরণে কী ব্যবস্থা নেওয়া হল, সাতদিনের মধ্যে তিনি জানাবেন।

এছাড়াও সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও কিছু দাবিতে তালডাংরা ও কোতুলপর ব্লকের বিডিও দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মীদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সিপিডিআরএস

দিল্লি সহ দেশ জুড়ে সংবাদমাধ্যম, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের ওপর অতর্কিতে পুলিশের স্বৈরাচারী আক্রমণ ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে ৫ অক্টোবর মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর পক্ষ থেকে কলকাতায় মেট্রো চ্যানেলে অবস্থান বিক্ষোভ হয়।

বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথ, কোষাধ্যক্ষ জ্ঞানতোষ প্রামাণিক, রাজ্য কমিটির সদস্য সৌম্য সেন সহ অন্যরা। উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি নভেন্দু পাল।

অবিলম্বে দিল্লিতে ইউএপিএ মামলায় গ্রেফতার সাংবাদিকদের মুক্তির দাবিতে বক্তারা সরব হন এবং দেশ জুড়ে সাধারণ নাগরিক সহ সমস্ত সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের স্বৈরাচারী আক্রমণের বিরুদ্ধে মানবাধিকার আন্দোলন তীব্র করার আহ্বান জানান।

পাটনায় পূর্বাঞ্চলীয় শিক্ষা কনভেনশন

একের পাতার পর

শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপ্রেমীদের এই লড়াই শুধু শিক্ষা বাঁচানোর লড়াই নয়, সভ্যতা ও মানবতা রক্ষার লড়াই।

মহান মানবতাবাদী সাহিত্যিক মুন্সি প্রেমচন্দর ৮৭তম স্মরণ দিবস ৮ অক্টোবর। ওই দিন এআইডিএসও আয়োজিত ছাত্র সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে অবসরপ্রাপ্ত আইএএস এবং বিহার রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ব্যাসজি বলেন, শিক্ষার কাজ হল যুক্তিচর্চা শেখানো, শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিন্তাভাবনা ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিকাশ ঘটানো। সেখানে জাতীয় শিক্ষানীতিতে ডারউইনের আবিষ্কৃত নিয়মগুলিও পাঠ্যসূচি থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে।

এইচবিটিইউ কানপুরের অধ্যাপক ডঃ ব্রজেশ সিং বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন খর্ব করে শিক্ষা কেন্দ্রীকরণের নামে কেন্দ্রীয় সরকার এর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে। সরকারের এই অপচেষ্টা স্বৈরাচারী প্রবণতার পরিচয়। ললিত নারায়ণ মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ ধর্মেন্দ্র কুমার বলেন, আজ নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুদের জন্য উচ্চমানের শিক্ষা, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তিনি বলেন, পুরনো, পচা ও রক্ষণশীল ধারণার বদলে আধুনিক মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

শিক্ষা কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় সভাপতি ভি এন রাজশেখর। তিনি বলেন 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০' হল সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে শিক্ষার সম্পূর্ণ বাণিজ্যিকীকরণের নীতি। স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষার উপর শাসক শ্রেণির ক্রমাগত আক্রমণ সত্ত্বেও ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার যেটুকু অবশিষ্ট এখনও টিকে আছে, তা মুছে ফেলাই এই নীতির লক্ষ্য।

কনভেনশনের সভাপতি এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ঘোষ বলেন, নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী স্কুল, কলেজ এবং কেন্দ্রীয় সহ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি প্রচুর বাড়ানো হয়েছে। সারা দেশে স্থায়ী শিক্ষকের ১১ লক্ষ পদ শূন্য।

এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের আন্দোলনে দলে দলে ছাত্রদের স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার এবং প্রতিটি স্তরে ছাত্র সংগ্রাম কমিটি গঠনের আহ্বান জানান তিনি। পূর্বাঞ্চলীয় এই কনভেনশনে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে ছয় শতাধিক ছাত্র প্রতিনিধি অংশ নেন। মূল প্রস্তাবের সমর্থনে ছাত্র প্রতিনিধিরা তাঁদের মতামত তুলে ধরেন।

কনভেনশনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা

আন্দোলন করে পরীক্ষায় বসার দাবি আদায় ঝাড়খণ্ডে

ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলায় বিদ্যালয় প্রশাসন ও জেলা শিক্ষা বিভাগের গাফিলতিতে ধলভূমগড় মডেল স্কুলের নবম শ্রেণির ১৭ জন ছাত্রছাত্রীর নাম নথিভুক্ত হয়নি। গত ছ'মাস ধরে অভিভাবকরা বিষয়টি লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট পদাধিকারীদের বার বার জানানো সত্ত্বেও কাজ হচ্ছিল না। এই অবস্থায় এআইডিএসও ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের যুক্ত করে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের চাপে ১৭ জনেরই নাম নথিভুক্ত করে তাদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয় এবং রেজাল্টও দেওয়া হয়। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন সংগঠনের পূর্ব সিংভূম জেলার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুবোধ মহালী।

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের ওড়িশা রাজ্য সম্মেলন

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের চতুর্থ ওড়িশা রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৪ সেপ্টেম্বর ভুবনেশ্বরের গীতগোবিন্দ সদনে। রাজ্যের নানা মেডিকেল ও প্যারামেডিকেল সংস্থা থেকে ২০০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ নেন। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা এবং সহ সভাপতি ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া। ভুবনেশ্বরের এইমস-এর গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ মানস কুমার পাণিগ্রাহী, কলিঙ্গ হাসপাতালে গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজির চিকিৎসক ডাঃ অনন্ত কুমার অগস্তি প্রমুখ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা সম্মেলনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। মূল প্রস্তাব এবং সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা ও ডাক্তারি শিক্ষা ব্যবস্থার নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন দশ জন ডাক্তারি ছাত্র। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে রাজ্য জুড়ে স্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

সম্মেলন থেকে ডাঃ সুরজিৎ সাহুকে সভাপতি ও ডাঃ প্রজ্ঞা অনির্বাণকে সম্পাদক করে সংগঠনের ৬৮ সদস্যের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

মধ্যপ্রদেশে ধর্ষণ ঃ রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ এআইএমএসএস-এর

সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনের মহাকাল শহরে ১২ বছরের এক বালিকা ধর্ষণের শিকার হয়। দুর্বৃত্তরা তাকে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত করে। তাদের থাবা থেকে কোনও ক্রমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু সাহায্যের জন্য সে পাগলের মতো দরজায় দরজায় ঘুরতে থাকে। তার বয়ানে জানা যায় তার মা-ও নির্যাতনের শিকার এবং নিখোঁজ। গুনা জেলার সাধোরা গ্রামেও অপর এক মহিলা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও শাস্তি এবং নারী নিরাপত্তার দাবিতে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন গুনা, উজ্জয়িন, ইন্দোর, অশোকনগর, জবলপুর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি জেলায় কালেক্টরেটের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেয়।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, গোটা মধ্যপ্রদেশ জুড়ে নারী ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে চলেছে। সরকারের নয়া মদ-নীতি, ফিল্ম প্রোমোটিং ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতির বৃদ্ধি পরিস্থিতিকে ভয়াবহ করে তুলেছে। নিখোঁজ মহিলাকে খুঁজে বের করা, ধর্ষিতা মেয়েটির চিকিৎসা ও লেখাপড়ার খরচ সরকারের পক্ষ থেকে বহনের দাবি জানানো হয়।

সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের উপর স্বৈরাচারী হামলা ঃ কর্ণাটকে বিক্ষোভ

কর্ণাটকের ধারওয়াড়ে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে বিক্ষোভ। ৬ অক্টোবর

আইনজীবীদের বিদ্যাসাগর স্মরণ

২৬ সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্ট (ছবি), বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, কোচবিহার, হাওড়া কোর্টে আইনজীবীরা বিদ্যাসাগরের ছবিতে মাল্যদান ও তাঁর জীবন সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করেন

কর্ণাটকে এআইডিএসও-র সম্মেলন

১-৩ সেপ্টেম্বর টুমকুর শহরে অনুষ্ঠিত হল এআইডিএসও-র ৮ম কর্ণাটক রাজ্য সম্মেলন। ১ সেপ্টেম্বর প্রকাশ্য সমাবেশে বিশিষ্ট অতিথি শিক্ষাবিদ ডোরাইরাজু বলেন, অগণতান্ত্রিক জাতীয় শিক্ষানীতি পিছিয়ে পড়া সমাজ এবং দরিদ্রদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে ছাত্রদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি ভি এন রাজশেখর জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা আহ্বান জানান।

প্রতিনিধি অধিবেশনে দেড় সহস্রাধিক ছাত্রের উপস্থিতিতে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ঘোষ বলেন, এআইডিএসও এবং জনগণের লাগাতার আন্দোলনের চাপে কর্ণাটক সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে। ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার পথে এআইডিএসও-কে কর্ণাটকের স্কুল, কলেজ, শহর ও জেলাগুলিতে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তিনি। সমাপনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই(সি) কর্ণাটক রাজ্য সম্পাদক এবং এআইডিএসও-র পূর্বতন নেত্রী কমরেড কে উমা। এআইডিএসও-র এই সম্মেলন টুমকুরের বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে কর্ণাটকের শিল্পী, সাহিত্যিক, চিত্র-পরিচালক সহ বিশিষ্টজনেরা রাজ্যবাসীর কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছিলেন। সম্মেলন থেকে এআইডিএসওর কর্ণাটক রাজ্য কাউন্সিল নির্বাচিত হয়। রাজ্য সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে অশ্বিনী কেএস ও অজয় কামাথ।

দেশ জুড়ে আন্দোলনের ডাক
জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির

অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে বন (সংরক্ষণ) সংশোধনী আইন-২০২৩ ও বন সংরক্ষণ অধিনিয়ম-২০২২ প্রত্যাহার এবং অরণ্যের অধিকার আইন-২০০৬ সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করার দাবিতে দেশ জুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে দাবি সংবলিত পোস্টকার্ডে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চলছে এবং এই দাবিগুলির সঙ্গে স্থানীয় দাবি-দাওয়া যুক্ত করে স্থানীয় প্রশাসনিক দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হচ্ছে। সংগঠনের ঘাটশিলা ব্লক শাখার উদ্যোগে ৫ অক্টোবর ব্লক আধিকারিকের দপ্তরে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে আট দফা দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন ব্লক কমিটির সভাপতি বৈজু মুরমু, উপদেষ্টা সুবোধ সিং, ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির সভাপতি পানমণি সিং।

এলাকাতে হাতির উপদ্রব প্রতিহত করতে যথাযথ ব্যবস্থা, হাতির আক্রমণে আহত ও নিহতদের যথাযথ চিকিৎসা ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া রোধে দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানানো হয়।

ডেঙ্গু রোধের দাবিতে বিক্ষোভ

কলকাতা ঃ শহর ও মফস্বল এলাকায় ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া ভয়াবহ আকার নিয়েছে। প্রতিরোধে স্বাস্থ্য দপ্তর ও কলকাতা পুরসভার দ্রুত যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ছিল, তা না করে সমস্যাকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা চলছে। এই অবস্থায় ডেঙ্গু রোধে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ওয়ার্ড স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা, মশা মারার তেল ছড়ানো, জমা জল নিষ্কাশন এবং সরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীর যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থার দাবিতে ৩ অক্টোবর এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে কলকাতা পুরসভা অভিযান হয়। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে একটি মিছিল কলকাতা পুরসভার সামনে পৌঁছলে সেখানে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ মৃদুল সরকারের নেতৃত্বে চারজনের প্রতিনিধিদল পুরসভার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে স্মারকলিপি দেন।

কলকাতা পুরসভা অভিযান

তমলুকে সারা বাংলা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ জেলায় ভয়াবহ ডেঙ্গু আক্রমণ মোকাবিলা সহ ১১ দফা দাবিতে ৫ অক্টোবর সারা বাংলা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির নেতৃত্বে তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও তমলুক স্বাস্থ্য জেলার আধিকারিকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান মানুষ। পরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তমলুক শহরে বিক্ষোভ মিছিল হয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক ডাঃ রামপদ সাঁতরা, প্রণব মাইতি প্রমুখ।

কল্যাণীতে মিড-ডে মিল কর্মীদের আলোচনাসভা

নদিয়ায় সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন, কল্যাণী ব্লক কমিটির উদ্যোগে ২ অক্টোবর কাটাগঞ্জ জিএসএফপি স্কুলে অনুষ্ঠিত হল 'শিক্ষানীতি-বিদ্যাসাগর-মিড-ডে মিল কর্মীদের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক আলোচনা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ভ্রান্ত শিক্ষানীতি, শিক্ষা আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা ও মিড-ডে মিল কর্মীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেন ব্যারাকপুর জেলা সাংগঠনিক কমিটির সদস্য অভিষেক দেবনাথ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে অনুষ্ঠানে কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সভা পরিচালনা করেন ব্যারাকপুর জেলা সাংগঠনিক কমিটির সদস্য দেবাশীষ ব্যানার্জী।

কামদুনি কাণ্ডে অপরাধীদের পুনর্বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই
দাবি এআইএমএসএস-এর

কামদুনির কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণ ও নৃশংসভাবে খুনের ঘটনার মামলা রায় সম্পর্কে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কল্পনা দত্ত ৮ অক্টোবর মন্তব্য করেন,

হাইকোর্টের রায়ে কামদুনি কাণ্ডে অভিযুক্ত ধর্ষক ও গণহত্যাকারীদের সাজা লঘু করা এবং কয়েকজনকে বেকসুর খালাস করার রায় পশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে হতাশ করেছে।

২০১৩ সালের ৭ জুন কামদুনির এক কলেজ-ছাত্রীকে নারকীয় অত্যাচার ও গণধর্ষণ করে দু'পা চিরে খুন করা হয়, যা ছিল বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা। সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সেই সময় অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি চেয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছিলেন, দোষীদের মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। অথচ ১০ বছর কেটে যাওয়ার পরেও অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া গেল না। জনগণ মনে করছেন পুলিশের অপদার্থতা ও সরকারি উকিলের ব্যর্থতার জন্যই এমন অঘটন ঘটল এবং মানুষ এর পিছনে গভীর ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই মামলা হাইকোর্টে চলাকালীন ১৪ বার সরকারি উকিল পরিবর্তন হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে মনে করি কামদুনি কাণ্ডে অপরাধীদের পুনর্বিচার করে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত।

বলি হল সিকিম

একের পাতার পর

জীবন দিয়ে চরম মূল্য দিতে হত না অসংখ্য অসহায় মানুষকে, হয়ত এই ভয়ঙ্কর ক্ষয়ক্ষতি কিছুটা হলেও এড়ানো যেত।

সরকারের অবহেলার কারণ কী? পর্যটনকে এখন কিছুটা লাভজনক শিল্প হিসাবে দেখছে একচেটিয়া মালিকরা। তাদের মুনাফা বাড়াতে প্রশাসনের সহায়তায় পাহাড়ের কোলে অপরিকল্পিত নগরায়ণ চলছে, যা ভঙ্গুর, ধসপ্রবণ পাহাড়ি এলাকার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এ ছাড়াও বিদ্যুতের ব্যবসায় বেশি মুনাফার খোঁজ পেয়ে পুঁজি মালিকরা ছুটছে সেদিকে। সরকারও তাদের সাহায্য করছে, যত্রতত্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ার অনুমতি দিচ্ছে। পাহাড়ের যেখানে-সেখানে ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ধসিয়ে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হয়েই চলেছে। প্রকৃতিও তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। যে কোনও সময় পাহাড়ে ধস নামছে। নদীর গতিপথ রুদ্ধ করে যত্রতত্র নির্মাণ কাজও বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ।

বিপর্যয়ের পর এসইউসিআই(সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দাবি জানায়। দলের পক্ষ থেকে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলা সহ রাজ্যে ত্রাণ সংগ্রহ করা হয়। ছবি ঃ শিলিগুড়ি

বিপর্যয়ের ডিনামাইটের উপর অবস্থান করছে তিস্তা বেসিনের দু'পাশে থাকা সিকিমের চুংথাং, লাচুং, মঙ্গন, দিকচু, সিংটাম, রঙ্গো ও মেলি এবং উত্তরবঙ্গের তিস্তা বাজার, সেবক, জলপাইগুড়ি সহ কয়েকটি স্থানের বসতি এলাকা। সরকার ও প্রশাসনের অবহেলা তাদের বিপদকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। হিমালয়ের মতো অতি 'সেনসেটিভ' একটি প্রাকৃতিক অঞ্চলকে যেমনতেমন ভাবে ব্যবহার করতে যাওয়া আত্মঘাতের সামিল। মুনাফালোভী বুর্জোয়া ব্যবস্থার পরিচালকরা প্রকৃতির সমস্ত সম্পদকে শোষণ করে মুনাফা করার তাগিদে তা জেনেও বিজ্ঞানীদের হুঁশিয়ারিকে অবহেলা করছে।

২০০৩ সালে প্রথম প্রকাশিত একটি গবেষণায় সতর্ক করা হয়েছিল, সিকিমের ১৪টি লেক অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। এরপর ২০১৩ এবং ২০১৭ সালে আরও দুটি গবেষণা করে বিপদের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন গবেষকরা। এমনিতেই কোনও নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে মুনাফার লক্ষ্যে চলা পুঁজিবাদী 'উন্নয়ন' বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটাচ্ছে। গলছে হিমবাহ। তাতে হঠাৎ করে জলস্ফীতি হলে হিমবাহ থেকে তৈরি হ্রদ সেই জল ধারণ করতে পারে না। সিকিমের লোহনক হ্রদ এই ধরনের হিমবাহী হ্রদ। সেজন্য দুর্ঘটনার আশঙ্কা ছিল। গবেষকদের ও বিশেষজ্ঞদের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে সরকার ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ১২০০ মেগাওয়াটের একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের অনুমোদন দেয়। এর ফলে সেখানে একটি বিশাল বাঁধ নির্মাণ করতে হয়। পরিবেশবিদদের মতামতের কোনও তোয়াক্কা না করেই এবং ভৌগোলিক অবস্থান বিচার না করে একতরফাভাবে এই সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। ভুটানের চুখা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মডেলে সিকিমের পর্যাপ্ত জল ব্যবহার করে ৫,২৪৮ মেগাওয়াট সম্পন্ন আরও ২৭টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা করে। কিন্তু কিছু জায়গায় স্থানীয় মানুষের প্রবল বিরোধিতায় বেশিরভাগ প্রকল্প অনুমোদন পায়নি, মাত্র ৯টি কেন্দ্র অবশেষে অনুমোদন পায়। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য নদীতে বাঁধ নির্মাণের সাথে সাথে অন্যান্য নির্মাণকাজও চলতে থাকে। এর ফলে পরিবেশের উপর কী বিরূপ প্রভাব পড়বে সে সব বিচার করা দরকার ছিল।

কিন্তু পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষায় দায়বদ্ধ সরকার কোনও প্রকল্প করার ক্ষেত্রে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাকে একদমই গুরুত্ব দেয় না। আশু লাভই তাদের কাছে বিচার্য। ফলে সরকারের চূড়ান্ত অবহেলায় বিপদ বেড়েই চলেছে।

প্রতি বছর কোথাও না কোথাও বিপর্যয় ঘটে চলেছে। সরকারি অবহেলার পরিণামে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও প্রকৃতির ধ্বংসযজ্ঞে আহুতি দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকেই।

ত্রাণ সংগ্রহে এআইডিএসও

কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রাণ সংগ্রহ করছে ছাত্রকর্মীরা

সরকারি অবহেলায় বেড়েই চলেছে যক্ষ্মা

‘যার হয় যক্ষ্মা, তার নাই রক্ষা’— প্রবাদ বাক্যটি একসময় মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করত। কারণ তখন টিবি রোগের কোনও ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। টিবি মানেই সেদিন ছিল মৃত্যুর পরোয়ানা। কত অমূল্য প্রাণ কেড়ে নিয়েছে এই ক্ষয় রোগ তার কোনও হিসেব নেই।

আজ একবিংশ শতাব্দীতে যখন চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পর্যন্ত ভারত পৌঁছে গেছে, তখনও কি আমরা আতঙ্কমুক্ত হতে পেরেছি? আজও টিবি রোগাক্রান্তের সংখ্যায় ভারতই জগতে শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত। ২০২০ সালে টিবি রোগীর সংখ্যা কিছুটা কমলেও, নজরদারির অভাবে ২০২১ সালে টিবি রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেছে ১৯ শতাংশ। বর্তমানে প্রতি বছর ২৬ লক্ষের উপরে মানুষের টিবি রোগ নির্ণীত হয়। অনির্ণীত রোগীর সংখ্যা এর থেকে ঢের বেশি। রেজিস্ট্যান্ট টিবিতেও ভারতে প্রতি বছরে ৪ লক্ষেরও বেশি সংখ্যক রেজিস্ট্যান্ট টিবি রোগী ধরা পড়ে। টিবিজনিত কারণে মৃত্যুর সংখ্যাতেও ভারতই সবার সেরা। এখনও আমাদের দেশে প্রতি ৩ মিনিটে একজন করে টিবি রোগীর মৃত্যু হয়। এডস আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে টিবি সংক্রমণের দিক থেকেও ভারত প্রথম স্থানে। তা সত্ত্বেও বর্তমানে টিবির ওষুধের সরবরাহ অনিয়মিত।

আগে চিকিৎসার জন্য ওষুধ না থাকলেও, সেদিন ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি ছিল না। এডস রোগী ছিল না। ডায়াবেটিসের মতো রিস্ক-ফ্যাক্টরগুলি আগে এতটা ছিল না। টিবি রোগীর সংস্পর্শে থাকা শিশুরাও আজ বিপুল সংখ্যায় এই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। টিবি রোগের ঝুঁকি বাড়ছে গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যেও। সেই কারণে বাড়ছে মাতৃ-মৃত্যুও। আর ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবির ক্ষেত্রে বাড়তি সমস্যা হল এদের সংস্পর্শে যারা আসছেন তারাও ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবিতেই আক্রান্ত হচ্ছেন। এই অবস্থায় টিবি রোগীর চিকিৎসার ওষুধ প্রায়শই অনিয়মিত হয়ে পড়ায় এই ধরনের রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। তেমনি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি রোগীদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধও দীর্ঘদিন ধরে অমিল, ফলে মৃত্যুর হারও বাড়ছে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত ২০২৫-এর মধ্যে টিবি নির্মূল কর্মসূচি আজ এক অলীক কল্পনায় পরিণত হয়েছে।

কেন এই শোচনীয় পরিণতি? এ কি অনিবার্য ছিল? মেডিসিন বিশেষজ্ঞরা বলেন, টিবি হল দরিদ্রের অসুখ। অপুষ্টি, অত্যধিক পরিশ্রম এবং ঘিঞ্জি অস্বাস্থ্যকর জায়গায় বসবাস এবং অস্বাস্থ্যকর কর্মস্থল— এ সবই টিবির মূল কারণ। ভারত ক্ষুধাসূচকে বিশ্বের ১০৩তম স্থান দখল করেছে। অপুষ্টি দারিদ্র বেকারত্বে যেখানে পৃথিবীর একেবারে হতদরিদ্র কিছু আফ্রিকার দেশের সমতুল স্থানে রয়েছে, সেখানে টিবিমুক্ত ভারতের স্বপ্ন? ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন ‘প্রধানমন্ত্রী টিবিমুক্ত ভারত অভিযান প্রকল্পের, ‘নি-ক্ষয় পোষণ যোজনা, নি-ক্ষয় মিত্র যোজনা’ ইত্যাদি প্রকল্প। জনসাধারণ তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়েও এসেছেন। বর্তমানে ৪০ হাজার ৪৯২ জন মানুষ স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে ১০ লক্ষ ৪৫ হাজার ২৬৫ জন টিবি রোগীর পুষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু অভাব অপুষ্টিই যেখানে এই রোগের কারণ সেখানে সরকার দায়িত্ব নিচ্ছে কতটুকু? রোগীপিছু পুষ্টি বাবদ মাসে বরাদ্দ মাত্র ৫০০ টাকা। তাও বর্তমানে ভীষণ অনিয়মিত হয়ে পড়েছে।

এই রোগ নির্মূলের কথা বললেই তো কেবল হবে না, তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, লোকবল কোথায়? বিগত দুই দশকে মনমোহন থেকে মোদি শাসনে এই প্রকল্পে লোকবল বাড়ানো হয়নি। নিযুক্ত করা হয়েছে দেশি বিদেশি এনজিওদের। বর্তমানে শাসকদল ঘনিষ্ঠ এনজিওরা তথাকথিত অলাভজনক সংস্থার আড়ালে এই প্রকল্প থেকে কোটি কোটি টাকার মুনাফা লুটছে। নয়ছয় হচ্ছে জনগণের সরকারি তহবিলের টাকা। ফল কী দাঁড়াচ্ছে? প্রোগ্রামের গতি বৃদ্ধির পরিবর্তে নানা জটিলতায় স্থবির হয়ে পড়ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সেন্ট্রাল টিবি ডিভিশনের বরাদ্দ অর্থের জোগান মাঝে মধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রোগ্রামগুলো মার খাচ্ছে ভীষণ ভাবে। ওষুধ সরবরাহ প্রায়ই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্র ওষুধ কেনার ব্যাপারে রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েই খালাস। রাজ্য বলছে এ তো কেন্দ্রের প্রোগ্রাম, তারা টাকা না দিলে রাজ্য পাবে কোথায়? সমস্যার এখানেই শেষ নয়। যতটুকুও টাকা রয়েছে, ওষুধ পাওয়া যাবে কোথা থেকে? কেন্দ্রীয় সরকার ওষুধ নীতি পরিবর্তন করার ফলে ওষুধ উৎপাদনের উপর আজ আর সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে বহু ক্ষেত্রে টাকা থাকলেও ওষুধ মিলছে না। অধিক মুনাফার লোভে ওষুধ কোম্পানিগুলি এই সব ওষুধ তৈরি করছে না। বিদেশনীতিতে গলদ থাকায় এবং আমাদের দেশে এইসব ওষুধের কাঁচামাল না থাকায় বহু ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানিতে অন্তরায় সৃষ্টি হওয়ার ফলেও ওষুধ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ফলে প্রয়োজনীয় ওষুধ সময়ে পাওয়া যাচ্ছে না। তা হলে এর উপায় কী? সরকার নিজে কি এর জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গড়ে তুলতে পারত না? রাষ্ট্রের অধীন ওষুধ সংস্থা থেকে এইসব ওষুধ তৈরি করা যেত না, যার উপরে সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকত? না, সরকার টিবি সহ নানা রোগ নির্মূলের কথা বললেও সে পথে হাঁটছে না। বরং স্বাধীনতার পরে যতটুকু সরকারি ওষুধ শিল্প গড়ে তোলা হয়েছিল, আজ তার বেশিরভাগকেই কর্পোরেট মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বা রুগ্ন করে রাখা হয়েছে। ফলে এই সংকটজনক মুহূর্তে দেশে আজ টিবির ওষুধ অমিল হয়ে পড়েছে। এর ফল কী? অনিয়মিত ওষুধ খাওয়ার জন্য রেজিস্ট্যান্ট টিবির সংখ্যা আরও বহুগুণে বেড়ে চলেছে।

রেজিস্ট্যান্ট টিবি থেকে রোগ ছড়ানোর মাত্রা কমানোর জন্য সবচেয়ে যেটা দরকার ছিল স্যানেটোরিয়ামে রেখে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। যেখানে উপযুক্ত পুষ্টির জোগান, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি করা যেত। কিন্তু বাস্তবে দেশে আগে যত স্যানেটোরিয়াম এবং জটিল টিবি রোগীর চিকিৎসার জন্য টিবি হাসপাতাল ছিল, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার তার বেশিরভাগই ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিয়েছে।

ফলে আজ সরকার চাইলেও এইসব রোগীদের আলাদা করে উপযুক্ত পরিবেশে উন্নত চিকিৎসা দিতে পারবে না। ১৯৭৮ সালে সরকার ঘোষণা করেছিল ২০০০-এর মধ্যে ভারত হবে টিবিমুক্ত। সরকারের উদাসীনতায় পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে ২০২৫-এর মধ্যে টিবি-মুক্তি প্রতিশ্রুতিতেই থেকে যাবে। সরকারের এই উদাসীনতা চিকিৎসার বেসরকারিকরণেরই অঙ্গ।

শারদীয় উৎসবের জন্য ছাপাখানা বন্ধ থাকায় আগামী দু’সপ্তাহ গণদাবী প্রকাশিত হবে না। পরবর্তী প্রকাশের তারিখ ৩ নভেম্বর ২০২৩

জীবনাবসান

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বিবেকানন্দ রায় ৩০ সেপ্টেম্বর কলকাতার ফর্টিস হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

১৯৭৯ সালে ময়না লোকাল কমিটির তৎকালীন সম্পাদক কমরেড নকুল জানার সাথে পরিচয়ের ভিত্তিতে এস ইউ সি আই (সি)-র চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কমরেড বিবেকানন্দ রায় দলের সাথে যুক্ত হন। পারিবারিক আর্থিক সংকট সামলাতে তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। সব সমস্যা উপেক্ষা করেই দলের কর্মসূচিতে সর্বদা সক্রিয় ভূমিকা নিতেন। দলের কাজে সময় দেওয়ার জন্য নিজের ছোট মুদির দোকানটি বন্ধ করে দেন তিনি। এলাকায় খেয়াভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধে, বছর বছর বন্যায় বিধ্বস্ত ময়নাকে বন্যামুক্ত করতে দলের উদ্যোগে এলাকার সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে ‘ময়না বাঁচাও কমিটি’ গড়ে তুলতে, কাঁসাই নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে, ময়নায় লোডিং-আনলোডিং শ্রমিকদের সংগঠিত করে দাবি আদায়ে আন্দোলন সহ এলাকার উন্নয়নে বহু আন্দোলন এবং মনীষী স্মরণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে তিনি নেতৃত্ব দেন। জেলায় পানচাষিদের সমস্যা নিয়ে, বাসভাড়া বৃদ্ধি এবং ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনগুলিতেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

দলের কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল এক নেতৃস্থানীয় সংগঠককে, এলাকার মানুষ হারালেন একজন অকৃত্রিম বন্ধুকে।

১ অক্টোবর তাঁর মরদেহ মেছেদার জেলা অফিসে পৌঁছলে এসইউসিআই(সি)-র পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা সহ দলের নেতা, কর্মী ও সমর্থক বৃন্দ শ্রদ্ধা জানান। মরদেহ ময়নায় নিয়ে যাওয়া হলে থানার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত তিন শতাধিক কর্মী-সমর্থক বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে শেষযাত্রায় অংশ নেন।

কমরেড বিবেকানন্দ রায় লাল সেলাম

উত্তর ২৪ পরগণায় বারাসাত-বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার হাবড়া লোকাল কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড দেবব্রত ঘোষ ৬ সেপ্টেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। ১৯৭৮ সালে ছাত্রাবস্থায় এস ইউ সি আই (সি) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষের মাধ্যমে তিনি দলের সংস্পর্শে আসেন এবং হাবড়া পার্টি সংগঠনের সাথে যুক্ত হন। বিপ্লবী সংগ্রামের পথে তিনি বেশ কিছু ছাত্র-যুবককে দলের চিন্তার সাথে ঘনিষ্ঠ করেন এবং লোকাল কমিটির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। তাঁর দরাজ কণ্ঠের সঙ্গীত ও কবিতা আবৃত্তি এলাকার বহু মানুষকে আকর্ষণ করত। ১৯৮০ সালে দলের দিল্লি অভিযান কর্মসূচিতে কমরেড দেবব্রত ঘোষ ইংরেজিতে এই অভিযানের উপর একটা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। এ রাজ্য থেকে দিল্লি অভিযানে অংশগ্রহণকারী কমরেডদের মধ্যে গানটি প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল। এলাকায় তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন।

ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার উপর তাঁর দখল ছিল খুবই ভাল। তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কিছু প্রবন্ধও ছোট গল্প ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। কর্মজীবনে সরকারি কর্মচারী হিসেবে দলের কর্মচারী আন্দোলনেও তিনি ভূমিকা নিয়েছেন।

১৯ সেপ্টেম্বর হাবড়াতে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। পার্টির কর্মীরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তাঁর আত্মীয়স্বজন, গুণমুগ্ধ বন্ধু ও ছাত্ররা। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল বিশ্বাস। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষ। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন দলের বারাসাত-বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার ইনচার্জ কমরেড তুষার ঘোষ।

কমরেড দেবব্রত ঘোষ লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

উত্তাল নদীর বাধা পেরিয়ে পরীক্ষা দিল ছাত্ররা

প্রবল জলোচ্ছ্বাসের কারণে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে দামোদর নদী পারাপার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের অভিভাবক

এবং শিক্ষকদের অনুরোধে নৌকা করে মাঝিরা পরীক্ষার্থীদের অপর পারে পৌঁছে দেয়। খবর পেয়ে পরীক্ষা গ্রহণকেন্দ্র অমরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে আচমকাই থানার বড়বাবু উপস্থিত হয়ে পরীক্ষা বন্ধকরার জন্য বলেন। পরিচালন কমিটির সদস্যরা তাঁকে জানান, এটি পর্ষদের রাজ্যস্তরীয় পরীক্ষা হওয়ায় এ ভাবে হঠাৎ তা বন্ধ করা যাবে না। সদস্যদের কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের কর্মকাণ্ড ও বৃত্তি পরীক্ষা সম্পর্কে সবটা শুনে পুলিশ সড়ক পথে পরীক্ষার্থীদের ওপারে পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাব দেয়।

কমিটির সদস্যরা সে খরচ বহনে অপারগ জানালে, বড়বাবু তাঁদের সে বিষয়ে ভাবতে বারণ করেন। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর থানা থেকে ফোন করে পরীক্ষার্থীদের নদী পেরনোর জন্য দ্রুত ঘাটে পাঠাবার অনুরোধ জানানো হয়। সেখানে পৌঁছে দেখা যায়, ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশাসন লাইফ জ্যাকেটের ব্যবস্থা করেছে এবং শুধুমাত্র পরীক্ষার্থীদের জন্যই নৌকো পারাপারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার তিন দিনের জন্যই এই ব্যবস্থা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বহাল রাখা হয়। পরীক্ষার উদ্যোক্তা প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের তরফ থেকে প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে আলোচনাসভা

এআইডিএসও মেডিকেল ইউনিটের পক্ষ থেকে ৫ অক্টোবর ‘চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস’ বিষয়ে একটি আলোচনাসভা হয় কলকাতার বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি হলে। এতে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মেডিকেল ও প্যারামেডিকেল ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেন। অনলাইনেও বহু ছাত্রছাত্রী অনুষ্ঠানে যোগ দেন। প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিকাশের ধারা নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক, এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ডাঃ শুভঙ্কর চ্যাটার্জী। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মনীষীদের জীবনসংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে আজকের দিনে মেডিকেল এথিক্সের চর্চার প্রয়োজনীয়তা তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরেন। উপস্থিত ছিলেন এআইডিএসও-র মেডিকেল ইউনিটের আহ্বায়ক ডাঃ সামস মুসাফির।

ভিওয়ানিতে স্কিম ওয়ার্কারদের বিশাল সমাবেশ

এআইইউটিইউসি এবং স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার আহ্বানে হরিয়ানায়

ভিওয়ানির হুডা পার্কে ৮ অক্টোবর এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অঙ্গনওয়াড়ি কার্যকর্তা সহায়কা ইউনিয়নের হরিয়ানা রাজ্য সভাপতি কৃষ্ণা মন্টানা, মিড-ডে মিল কার্যকর্তা ইউনিয়নের প্রধান রাজবালা, হরিয়ানার আশা কার্যকর্তা ইউনিয়নের সভাপতি মধু দেবী। সমাবেশের প্রধান অতিথি, এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় সহসভাপতি কমরেড সত্যবান তাঁর ভাষণে বলেন, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য— দেশের কোনও সরকারই স্কিম ওয়ার্কারদের ন্যূনতম বেতন দিচ্ছে না। স্কিম ওয়ার্কাররা যেটুকু দাবি আদায় করেছেন, লড়াই করেই তা করেছেন। ফলে সরকারের রঙ যাই হোক, শ্রমিকদের দাবি আদায়ের জন্য লড়াই-ই একমাত্র রাস্তা। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন হরিয়ানার সংযুক্ত কর্মচারী মঞ্চের সম্পাদক মাস্টার সুবে সিং, এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি রাজেন্দ্র সিং প্রমুখ।

আশাকর্মীদের নবান্ন অভিযান

৬ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ন এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী (কন্ট্রাকচুয়াল) ইউনিয়নের নেতৃত্বে নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। সারা রাজ্য থেকে প্রায় ২০ হাজার আশাকর্মী এই কর্মসূচিতে যোগদান করেন। স্লোগান মুখরিত মিছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে ধর্মতলার দিকে এগোতে থাকে। সরকারি তরফে স্মারকলিপি গ্রহণের কোনও ব্যবস্থা নেই জেনে আশাকর্মীরা চৌরঙ্গীর মোড় প্রায় দু’ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে লিখিত স্মারকলিপি কালীঘাটে তাঁর বাড়িতে জমা দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যভবনে মিশন ডিরেক্টরের সঙ্গে সংগঠনের প্রতিনিধিদল দেখা করে আর একটি স্মারকলিপি তাঁর হাতে তুলে দেন। এছাড়াও বিধানসভা ভবনে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দেখা করে সমস্যা ও দাবি-দাওয়াগুলি নিয়ে আলোচনা করেন এবং সেগুলি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন।

আশাকর্মীরা সরকারি কর্মীদের মতোই স্থায়ী পরিষেবা ক্ষেত্রে কাজ করা সত্ত্বেও নিয়োগের সময় থেকেই তাঁদের ‘স্বেচ্ছাসেবিকা’ নাম দিয়ে শ্রমিকের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিও আলাদা নয়।

মালিকের মুনাফার স্বার্থে এ দেশে কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারগুলি বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অর্জিত শ্রমিকদের অধিকারগুলি এক এক করে কেড়ে নিচ্ছে। সেই পথ ধরেই বর্তমানে স্থায়ী শ্রমিক-কর্মচারীর ধারণাটিকেই তুলে দিতে চাইছে তারা। স্থায়ী কাজের বদলে প্রকল্পভিত্তিক কাজ চালু করা হয়েছে। ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশনের অন্তর্গত আশাও এই ধরনের একটা প্রকল্প। প্রকল্পের আওতায় এনে আশাকর্মী ও পৌর স্বাস্থ্য কর্মীদের নামমাত্র সাম্মানিক ভাতা দিয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকারও যে ভাতা দেয় তা খুবই সামান্য। অথচ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজ ছাড়াও বহু অতিরিক্ত কাজ, নানা সরকারি প্রকল্পের কাজ করতে করতে এই সব কর্মীরা আজ সাংঘাতিক রকমের কর্মভারে পিষ্ট হচ্ছেন। তাঁরা যতটুকু ইন্সেন্টিভ পান, তা-ও অনিয়মিত, ভেঙে ভেঙে দেওয়া হয়, নানা অজুহাতে তা কেটেও নেওয়া হয়। এর উপর বলা হচ্ছে— ‘নো ওয়ার্ক নো পে’।

রাজ্য সরকারের দেয় ভাতা বৃদ্ধি, সমস্ত পৌরসভায় ১০০০-১২০০ জনসংখ্যার মধ্যেই কাজ করানো, পৌরসভায় নিজস্ব ফান্ড থেকে ভাতা প্রদান, সকলকে কাজের সুবিধার জন্য মোবাইল বাবদ ১৫ হাজার টাকা দেওয়া, ইন্সেন্টিভ ভাগে ভাগে দেওয়া বন্ধ করা, পিএমএমভিভিওয়াই-এর মতো স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বাইরের অন্য কাজ আশাকর্মীদের দিয়ে না করানো, কর্মরত অবস্থায় কোনও আশাকর্মীর মৃত্যু হলে অবসরকালীন ভাতা ৩ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা সেই পরিবারকে সাহায্য করা, প্রকল্প নয়,আশা কর্মীদের সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি প্রদান সহ আরও বহু দাবি নিয়ে এআইইউটিইউসি-র পক্ষ থেকে লাগাতার আন্দোলন জেলায় জেলায় ব্যাপক আকার নিয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এই নবান্ন অভিযান।

কর্মসূচির শেষে নেতৃবৃন্দ জানান, দাবিগুলি বাস্তবায়িত না হলে আগামী দিনে আশাকর্মী ও পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা কর্মবিরতিতে যেতে বাধ্য হবেন।

দিল্লিতে আশাকর্মীদের ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল

‘দিল্লি আশা ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন’ (দাওয়া ইউনিয়ন)-এর ডাকে আশাকর্মীরা অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। কিন্তু সেখানকার আপ সরকার আশাকর্মীদের দাবি-দাওয়ায় কর্ণপাত পর্যন্ত করছে না। এর বিরুদ্ধে ধর্মঘটের ৩৮ তম দিবসে শহিদি পার্কে আইটিও থেকে দিল্লি সচিবালয় পর্যন্ত মোমবাতি মিছিল করেন। শত শত আশাকর্মীর সোচ্চার স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে দিল্লির রাজপথ। প্যারেলাল ভবনের সামনে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করলে সেখানেই বিক্ষোভসভা হয়।

বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন দাওয়া ইউনিয়নের কার্যকরী সভানেত্রী শিক্ষা রানা, সভানেত্রী সোনু জি, সাধারণ সম্পাদক ঊষা ঠাকুর প্রমুখ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক ম্যানেজার চৌরাসিয়া সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। আশাকর্মীদের সমর্থনে কিশোর সংগঠন কমসোমল সদস্যরাও বক্তব্য রাখেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com